Pratidhwani the Echo
A Peer-Reviewed International Journal of Humanities & Social Science
ISSN: 2278-5264 (Online) 2321-9319 (Print)
Impact Factor: 6.28 (Index Copernicus International)
Volume-XIV, Issue-III, April 2026, Page No. 15-21
Published by Dept. of Bengali, Karimganj College, Sribhumi, Assam, India
Website: http://www.thecho.in
DOI: 10.64031/pratidhwanitheecho.vol.14.issue.03W.077

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের গল্পে দুর্ভিক্ষ ও সামাজিক অবক্ষয়: প্রসঙ্গ 'আজ কাল পরশু' ও 'দুঃশাসনীয়' গল্প

ড. আনন্দ ঘোষ, *সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, জি.এল. চৌধুরী কলেজ, বরপেটা রোড, অসম, ভারত*

Received: 21.04.2026; Accepted: 27.04.2026; Available online: 30.04.2026
©2026 The Author(s). Published by Dept. of Bengali, Karimganj College, Sribhumi. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract

The devastating famine of 1943 is reflected in several short stories by Manik Bandopadhyay. In his works, we observe the tragic consequences of acute food shortages, lack of clothing, women's helplessness, social degradation, and exploitation caused by the famine. In this context, his stories *"Aaj Kal Parashu"* and *"Dushashaniya"* are particularly noteworthy. Through the female characters Mukta, Bhuti, and Rabeya, the author demonstrates that famine does not merely create a scarcity of food, but also endangers women's freedom, dignity, and very existence.

The study reveals that due to the shortage of clothing, women become confined indoors, humiliated, and mentally distressed, ultimately moving toward tragic ends. In particular, Rabeya's self-sacrifice emerges as a symbol of extreme female helplessness. This helplessness stems from the scarcity of clothing and the severe inequality in distribution driven by the exploiting class, culminating in Rabeya's deliberate self-destruction. This outcome represents the predetermined tragic conclusion of the fragmented scenes throughout the stories.

In my discussion, I will attempt to show how, in the stories *"Aaj Kal Parashu"* and *"Dushashaniya,"* the narrative transcends individual tragedy to portray the broader social and psychological crisis faced by women oppressed by famine.

Keywords: Famine, Women's Life, Clothing Scarcity, Social Reality, Self-respect, Tragedy

বাংলা কথাসাহিত্যের ইতিহাসে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় এক উজ্জ্বল নক্ষত্র। তাঁর গল্পে সমাজবাস্তবতা, দারিদ্র্য, দুর্ভিক্ষ, মানবিক সংকট এবং শোষিত মানুষের জীবন অত্যন্ত জীবন্তভাবে ফুটে ওঠেছে। তাঁর 'দুঃশাসনীয়' (১৯৪৭) ও 'আজ কাল পরশু' গল্প দুটি উল্লেখযোগ্য গল্প, যেখানে দুর্ভিক্ষপীড়িত গ্রামবাংলার বস্ত্রসংকট এবং বিশেষ করে নারীদের অসহায় অবস্থার এক নির্মম বাস্তবচিত্র অঙ্কিত হয়েছে। গল্পটি যেন বাস্তবতারই এক নির্মম দলিল, যেখানে সমাজের প্রান্তিক ও অসহায় নারীর জীবনের করুণ পরিণতি তুলে ধরা হয়েছে। এই গল্পে নারী চরিত্র কেবল ব্যক্তি নয়; সে এক বৃহত্তর সামাজিক ব্যবস্থার শিকার। পিতৃতান্ত্রিক সমাজ, অর্থনৈতিক সংকট এবং নৈতিক অবক্ষয়ের ফলে নারীর যে অসহায়তা সৃষ্টি হয়, তার এক গভীর চিত্র এই গল্প দুটিতে পাওয়া যায়। 'দুঃশাসনীয়' কেবল একটি গল্প নয়, বরং এটি একটি সামাজিক প্রতিবাদও বটে। গল্পটির কেন্দ্রে রয়েছে এমন এক সমাজ, যেখানে খাদ্যের অভাবের সঙ্গে সঙ্গে বস্ত্রের অভাব নারীর জীবনকে আরও ভয়াবহ করে তুলেছে। পুরুষেরা অন্তত অর্ধনগ্ন অবস্থায় বাইরে যেতে পারে, কিন্তু নারীরা সামাজিক

লজ্জা ও শালীনতার বেড়াজালে ঘরের মধ্যে বন্দি হয়ে পড়ে। এই বন্দিদশা শুধু শারীরিক নয়, মানসিকও। তাদের কাছে কাপড়ের অভাব মানে স্বাধীনতার অভাব, চলাফেরার অধিকার হারানো, এমনকি সন্তানের ক্ষুধা মেটানোর ক্ষমতাও হারানো। অন্যদিকে 'আজ কাল পরশু' গল্পটি বাংলা কথাসাহিত্যের এক গভীর মানবিক দলিল, যেখানে সমাজের নিম্নবর্গের মানুষের জীবনসংগ্রাম ও বিশেষ করে নারীর করুণ পরিণতি অত্যন্ত সংবেদনশীলভাবে চিত্রিত হয়েছে। এই গল্পে লেখক শুধু একটি ব্যক্তিগত ট্র্যাজেডি নয়, বরং একটি বৃহত্তর সামাজিক বাস্তবতার প্রতিফলন তুলে ধরেছেন। গল্পে মুক্তা চরিত্রটি মূলত দারিদ্র্য, সামাজিক অবহেলা এবং পুরুষতান্ত্রিক মানসিকতার শিকার। তার জীবনে 'আজ', 'কাল' এবং 'পরশু'— এই তিনটি সময়পর্ব যেন আশার, হতাশার এবং চূড়ান্ত বিপর্যয়ের প্রতীক। শুরুতে সে সামান্য স্বপ্ন ও আশা নিয়ে বাঁচতে চায়, কিন্তু ক্রমে অর্থনৈতিক সংকট ও সামাজিক চাপ তার জীবনকে দুর্বিষহ করে তোলে।

গবেষণার উদ্দেশ্য:

গবেষণার মূল উদ্দেশ্যগুলো হলো- 'দুঃশাসনীয়' ও 'আজ কাল পরশু' গল্পে নারীর অসহায়তার চিত্র বিশ্লেষণ করা এবং সমাজব্যবস্থার প্রভাব কীভাবে নারীর জীবনে ট্র্যাজেডি সৃষ্টি করে, তা অনুসন্ধান করা। এছাড়া পিতৃতান্ত্রিক কাঠামো ও অর্থনৈতিক সংকটের ভূমিকা নির্ণয় করে সমাজচেতনা অনুধাবন করা।

গবেষণার পরিসর:

এই গবেষণা পত্রটি মূলত 'দুঃশাসনীয়' ও 'আজ কাল পরশু' গল্পের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। এখানে— প্রধান নারী চরিত্রের জীবনসংগ্রাম, পারিবারিক ও সামাজিক প্রেক্ষাপট, অর্থনৈতিক অবস্থার প্রভাব এবং লেখকের বাস্তবতাবাদী দৃষ্টিভঙ্গি -এই বিষয়গুলো বিশ্লেষণের আওতায় আনা হয়েছে। তবে প্রয়োজন অনুসারে বাংলা সাহিত্যের অন্যান্য বাস্তবতাবাদী ধারা সম্পর্কেও সংক্ষিপ্ত উল্লেখ করা হয়েছে।

গবেষণা পদ্ধতি:

এই গবেষণা পত্রটি প্রস্তুত করতে মূলত বর্ণনাত্মক ও বিশ্লেষণাত্মক পদ্ধতি অনুসরন করা হয়েছে। গল্পের মূল পাঠ গভীরভাবে বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

গবেষণার উৎস:

আলোচনা পত্রের মূল উৎস হিসেবে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'গল্প সমগ্র'গ্রন্থটি গ্রহণ করা হয়েছে। এছাড়া কিছু সমালোচনামূলক গ্রন্থের সাহার্য্য নেওয়া হয়েছে।

প্রথমে আমরা 'দুঃশাসনীয়' গল্পটির নাম ও প্রেক্ষাপট নিয়ে আলোচনা করব। তাহলেই মূল বিষয়টি আমাদের কাছে অতি সহজে পরিস্ফুট হবে। 'দুঃশাসনীয়' গল্পটির নামের ব্যঞ্জনা গল্পের কেন্দ্রীয় বক্তব্যের সঙ্গে গভীরভাবে ওতঃপ্রোত। কোনো বিশেষ চরিত্র এই নামে জড়িত নেই। গল্পের এমন বিশেষ নাম নিশ্চিত ব্যঞ্জনাধর্মী এবং শিল্পের মাপে সুপ্রযুক্ত। প্রথম কথা হল, গল্পের নামে আছে 'দুঃশাসন' শব্দটি। মহাভারতের কৌরব বংশের সূত্রে এই নামটি অবশ্যই অতি পরিচিত। দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণ করে তাকে সম্পূর্ণ নগ্ন করার যে বিকৃত বাসনা ছিল পুরাণের অন্যতম নায়ক দুঃশাসনের মনে, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় তার এক রূপক ভাবনাকে এ গল্পে যোগ করেছেন। গল্পে তিনি উলঙ্গ নারীমূর্তিগুলিকে কায়ারূপে দেখেননি, দেখাননি পাঠকদের, এনেছেন ব্যঞ্জনানির্ভর 'ছায়া' স্বভাবের দ্যোতনায়। তা বোঝাতে গিয়ে বলেছেন- 'কোনো ছায়াকে ঘিরে থাকে শুধু সীমাহীন রাত্রির আবছা আঁধার, কুরু-সভায় দ্রৌপদীর অন্তহীন অবর্ণনীয় রূপক বস্ত্রের মতো।'

মহাভারত পুরাণে আছে, প্রথম পাশাখেলায় দ্রৌপদীকে পণ রেখে যুধিষ্ঠির পরাজিত হলে, দুর্যোধনের আদেশে একবস্থা, রজঃস্বলা দ্রৌপদীর চুলের মুঠি ধরে দুঃশাসন সভায় আনে এবং যেমন অশ্লীল ভাষায়

বিদ্রুপ করে, তেমনি অঙ্গরাজ কর্ণের প্ররোচনায় দ্রৌপদীকে উলঙ্গ করতে প্রয়াসী হয়। কিন্তু বস্ত্রের সীমাহীনতায় তার সমূহ ক্লান্তি আসে। 'দুঃশাসনীয়' গল্পে সর্বহারা দরিদ্র শ্রেণীর নারীদের উলঙ্গ রূপ ঢাকা থাকে-দিনরাত্রির প্রাকৃতিক নিয়মে রাত্রিকালীন আবছা অন্ধকারের আবরণে। এভাবে যে রূপক-ভাবনা দিয়ে লেখকের নগ্ন মূর্তিগুলির লজ্জা নিবারণের প্রয়াস, তাই গল্পের পটভূমি হয়েছে আদ্যন্ত। লক্ষণীয়, গল্পের আরম্ভ থেকে শেষ পর্যন্ত পটভূমিতে একবারও দিনের আলো নেই। রাত্রির গভীর অন্ধকার, আবছা অন্ধকার বা গাঢ় অন্ধকার থেকে ক্ষীণ চাঁদের আলোয় নগ্নমূর্তিগুলির চলাফেরা নিয়ন্ত্রিত হয়েছে। দ্রৌপদীর রূপক বস্ত্র দ্রৌপদীর পক্ষে, আর প্রকৃতির সহজ অন্ধকার নগ্ন নারীমূর্তিগুলির পক্ষে একই। গোটা গল্পে সেই আবরণ থাকায় পৌরাণিক সমার্থক ব্যঞ্জনায় গল্পনাম সার্থকতা পায়।

আমরা জানি পঞ্চাশের মন্বন্তরের অব্যবহিত পরবর্তী কাল বস্ত্রসংকট দেখা দিয়েছিল। সে সময়ের শাসকরা শোষকের রূপ ধরে বস্ত্রসংকটকে অবধারিত করেছে। তাকে সাহায্য করেছে শাসকের শাসনযন্ত্র, পুলিশ ইন্সপেক্টর সুদেবরা যেমন, তেমনি মধ্যস্বত্বভোগী আজিজ, সুরেন ঘোষের মতো দালালরাও। এরা কালোবাজারি মুনাফাখোর মজুতদার। এদের প্রথম আবির্ভাব বুর্জোয়া সমাজব্যবস্থার উপযোগী দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ সমকালীন পরিবেশেই। সেই সময়ে যারা শাসক, তারাই শোষক। শাসকশ্রেণীর বিকৃত শাসনব্যবস্থা ছিল নির্লজ্জ, দুঃখজনক, তারই ফল নারীদের নগ্নদেহে দিনযাপন।

'দুঃশাসন' শব্দটির ব্যুৎপত্তিগত আর একটি অর্থ হল 'দুঃখে শাসনীয়'। এই অর্থ ধরলে হাতিপুর গ্রামের নগ্ন নারীদের যে আত্মস্খলন বা সংযম- তা হল নিজেদের নগ্ন থাকার লজ্জাকে সংযমের মধ্যে রাখা। বস্ত্রের অভাবের দুঃখ তাদের ভাগ্যে ছিল অবধারিত সত্য- তা সাময়িকতায় সীমা পেলেও; কিন্তু অত্যন্ত দুঃখের দিনেও তারা রাত্রির অন্ধকারে তাদের লজ্জাকে, শাসন-সংযমে রাখতে আপ্রাণ চেষ্টা করে। সে প্রয়াসে পরাজয় আছে, কয়েদখানার জীবন-যন্ত্রণা আছে- 'কতকাল এমনি কয়েদ হয়ে থাকবো মা?' ভোলা নন্দীর মেজো ছেলের বউ পাঁচীর এমন উক্তিতেই তার প্রমাণ, আছে হতাশা, গ্লানি, বাঁচার অপমান। তবু নগ্ন নারীগুলি নানা বয়সের অনুপাত নির্বিশেষে লজ্জাকে সামনে রেখে রাত্রির অন্ধকারে আত্মনিগ্রহের দিন অতিবাহিত করে। সে সব অবশ্যই এক অর্থে 'দুঃখে শাসনীয়'। এমন আত্মশাসনকে অস্বীকার করে, অপমানকে বড় করে দেখে আনোয়ারের বউ রাবেয়া শেষে আত্মহত্যা করে। সে তীব্র প্রতিবাদ জানিয়ে দুঃখের অতীত লোকে চলে যায়। যে নারীর বড় লজ্জা দুঃশাসনীয় থাকে, তা থেকে অতিক্রমই গল্পের শেষ চিত্রের ব্যঞ্জনা পায়।

'দুঃশাসনীয়' গল্পটি এমন এক সমাজচিত্র তুলে ধরে যেখানে দরিদ্রতা, শোষণ ও অবিচার নিত্যদিনের ঘটনা। এই সমাজে নারীর অবস্থান অত্যন্ত দুর্বল। অর্থনৈতিক সংকট ও সামাজিক অবক্ষয়ের কারণে নারীরা নিজের জীবনের উপর নিয়ন্ত্রণ হারায়।এখানে 'দুঃশাসনীয়' শব্দটি নিজেই একটি প্রতীক— যা শাসনের অযোগ্য বা নিয়ন্ত্রণহীন এক সমাজব্যবস্থার দিক নির্দেশ করে। এই ব্যবস্থায় ন্যায়-অন্যায়, নৈতিকতা— সবকিছুই ভেঙে পড়ে। হাতিপুর গ্রাম দুর্ভিক্ষের কবলে প্রায় নিঃশেষ। তারপর ও যে কটা মানুষ বেঁচে আছে তাদের পড়নে কাপড় নেই। মেয়েরা সূর্য ডোবার পর ঘরের কোণ থেকে বেরোয়। আঁধারে ছায়ার দল ডোবাপুকুরে বাসন মাজে,কলসী কাঁখে উঠে আসে।তারা মানবী নয়, ছায়া। লেখকের ভাষায়-

> "কোনো ছায়ার গায়ে লটকানো থাকে এক ফালি ন্যাকড়া, কোনো ছায়ার কোমরে জড়ানো থাকে গাছের পাতার সেলাই করা ঘাঘরা, কোনো ছায়াকে ঘিরে থাকে শুধু সীমাহীন রাত্রির আবছা আঁধার, কুরু-সভায় দ্রৌপদীর অন্তহীন অবর্ণনীয় রুপক বস্ত্রের মতো।"[১]

গল্পে ভুতি নামের নারী চরিত্রটির মধ্য দিয়ে এই অসহায়তার একটি করুণ রূপ আমরা দেখতে পাই। তার ঘরে একটি মাত্র কাপড়, যা পরিবারের সব নারীর মধ্যে ভাগাভাগি করে ব্যবহার করতে হয়। ফলে অধিকাংশ সময় তাকে প্রায় উলঙ্গ অবস্থায় ঘরের মধ্যে লুকিয়ে থাকতে হয়- "ভূতির স্বামী গদাধর কাজ আর কাপড়ের খোঁজে বেরিয়েছে আজ এগারো দিন।"[২] তার ছেলে কানু ক্ষুধার জ্বালায় ভাত চাইতে থাকে, কিন্তু মা হয়েও ভুতি ছেলের সামনে বেরোতে পারে না, কারণ শরীরে ঢাকার মতো কাপড় তার নেই।

> "সেদিন হঠাৎ তাকে উলঙ্গ দেখে কানু যেমন হি হি করে হসেছিল, আজও যদি তেমনি করে হাসে? চোখ ফেটে জল আসতে চায় ভূতির, জল পড়ে না। হঠাৎ মাদুরটা চোখে পড়ে। ....মাদুরটা সে নিজের গায়ে জড়ায়।"[৩]

ভূতির মাতৃত্বের এই অসহায়তা পাঠকের হৃদয়কে গভীরভাবে নাড়া দেয়। অবশেষে ছেঁড়া মাদুর জড়িয়ে বাইরে এসে ভাত নামাতে গিয়ে হাঁড়ি ভেঙে যায় এবং ভাত মাটিতে ছড়িয়ে পড়ে। তখন ভুতির কান্না যেন শুধু নিজের জন্য নয়, সমগ্র অসহায় নারীসমাজের কান্না হয়ে ওঠে। গল্পের এই নারী চরিত্রটি জীবনের প্রতিটি স্তরে বঞ্চনার শিকার। পরিবারে সে অবহেলিত, সমাজে সে নিরাপত্তাহীন, অর্থনৈতিকভাবে সে সম্পূর্ণ নির্ভরশীল ।এই তিনটি স্তর তাকে ক্রমশ ভেঙে দেয়। তার জীবনে কোনো স্বাধীনতা নেই, নেই আত্মমর্যাদার স্থান। ফলে সে এক নিষ্ঠুর পরিণতির দিকে ধাবিত হয়। এই করুণ কাহিনী পাঠকের মনে গভীর সহানুভূতি সৃষ্টি করে এবং সমাজের প্রতি প্রশ্ন তোলে। এপ্রসঙ্গে সাহিত্য সমালোচক বীরেন্দ্র দত্ত বলেছেন-

> "মানুষের তৈরি করা বস্ত্র সংকট ও এক নিষ্পাপ মা-মূর্তি রমণীর উলঙ্গ শরীর বেয়ে সেই সংকটজনিত বস্ত্রহীনতার যে লজ্জা, যে সূক্ষ্ম অনন্বয়ের যন্ত্রণা- তা গল্পোকারের হাতে বাস্তবতাকে শিল্পধন্য করে তোলে।"[৪]

গল্পটির মধ্যে আমরা দেখি-এখানে নারীর করুণ পরিণতি শুধু দারিদ্র্যের জন্য নয়, সমাজের নির্মিত লজ্জাবোধের কারণেও। পুরুষশাসিত সমাজ নারীর শরীরকে এমনভাবে নিয়ন্ত্রণ করে যে, কাপড় না থাকলে সে ঘর থেকে বেরোতে পারে না। ফলে দুর্ভিক্ষের সময় খাদ্যের চেয়েও বস্ত্র তার কাছে বড়ো সংকট হয়ে ওঠে। এই সামাজিক বাস্তবতা লেখক অত্যন্ত তীক্ষ্ণভাবে তুলে ধরেছেন। এপ্রসঙ্গে অরুণ কুমার মুখোপাধ্যায় বলেছেন-

> "যুদ্ধ আর আকাল দুয়ে মিলে যেদিন বাংলার নরনারীর বস্ত্রহরণ করেছিল সেদিন বিদেশী শাসকের অনুগ্রহপুষ্ট চোরাকারবারীর দল কণ্ট্রোলের কাপড় কালোবাজারে বিক্রি করে মুনাফা করেছিল আর গাঁয়ে গঞ্জে গরীব মানুষ উলঙ্গ ও প্রায় উলঙ্গ হয়ে দিন কাটাচ্ছিল।"[৫]

গল্পে আরেকটি মর্মান্তিক চরিত্র হল রাবেয়া। সে তার স্বামী আনোয়ারকে স্পষ্ট জানিয়ে দেয়—আজ যদি কাপড় না আনে, তবে সে আর বাঁচবে না- "আজ যদি কাপড় না আনবে তো তোমায় আমায় খতম। পুকুরে ডুবব, খোদার কসম।"[৬] দুর্ভিক্ষের দিনে না খেয়ে থাকা সে মেনে নিয়েছে, শাকপাতা খেয়ে দিন কাটিয়েছে, কিন্তু উলঙ্গ অবস্থায় বেঁচে থাকার অপমান সে আর সহ্য করতে পারে না। তাই সে স্বামীকে গঞ্জনা করে বলে- "বিবিকে যে পরনের কাপড় দিতে পারে না সে কেমন মরদ, তার আবার শাদি করা কেন? "[৭] এখানে বোঝা যায়, নারীর কাছে সম্মান ও আত্মমর্যাদা জীবনের মতোই গুরুত্বপূর্ণ।

'হাতিপুরের ঘরে ঘরে খবর রটে যায়, কাপড় পাওয়া যাবে না।' আনোয়ার কাপড় জোগাড় করতে ব্যর্থ হয়। এই ব্যর্থতার খবর রাবেয়া আগেই বুঝতে পারে। তার মধ্যে এক অদ্ভুত নির্লিপ্ততা নেমে আসে। সে শান্তভাবে কথা বলে, যেন নিজের পরিণতি মেনে নিয়েছে। তারপর শরীর থেকে ছেঁড়া চটের পর্দাটুকুও খুলে

ফেলে দেয়। এই মুহূর্তটি প্রতীকী— সে যেন সমাজের সমস্ত ভণ্ড শালীনতা, অপমান এবং দুঃসহ লজ্জাকে ছুড়ে ফেলে দেয়।

শেষ পর্যন্ত রাবেয়ার আত্মহননের মধ্য দিয়ে গল্পটি এক চরম ট্র্যাজিক পরিণতিতে পৌঁছায়। কাপড় না পাওয়ার অপমান, স্বামীর অসহায়তা, সমাজের নিষ্ঠুর নিয়ম— সব মিলিয়ে সে পুকুরের জলে ডুবে মৃত্যুকে বেছে নেয়-

> "কাপড় যে দিতে পারে না এমন মরদের পাশে আর শোবে না বলে রাবেয়া একটা বস্তায় কতকগুলি ইট-পাথর ভরে মাথাটা ভিতরে ঢুকিয়ে গলায় বস্তার মুখটা দড়ি জরিয়ে এঁটে বেঁধে পুকুরের জলের নিচে, গিয়ে শুয়ে রইল।"[৮]

লেখক অত্যন্ত শ্লেষাত্মক ভঙ্গিতে দেখিয়েছেন যে, যে সমাজ নারীর ন্যূনতম বস্ত্রের ব্যবস্থাও করতে পারে না, সেখানে তার বেঁচে থাকাও অর্থহীন হয়ে ওঠে।

'আজ কাল পরশু' (১৯৪৬) পঞ্চাশের মন্বন্তর ও দুর্ভিক্ষের পটভূমিতে লেখা একটি বাস্তববাদী ছোট গল্প। দুর্ভিক্ষে অনাহারে মৃত্যু, নৈতিক অবক্ষয় এবং চোরাকারবারিদের দাপটের মধ্যে গ্রামীণ জীবনের চরম দুর্দশা ও টিকে থাকার সংগ্রাম ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। গল্পের কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে রামপদ, তার স্ত্রী মুক্তা এবং গ্রামের বিত্তশালী ঘনশ্যাম। এই গল্পে আমরা দেখি মানসুকিয়া গ্রামে খাদ্যাভাবে হাহাকার। রামপদ তার স্ত্রী মুক্তাকে রেখে কাজের সন্ধানে শহরে যায়। এদিকে অনাহারে মুক্তার সাত মাসের ছেলে মারা যায়। ক্ষুধার জ্বালায় ও অভাবের চাপে মুক্তা গ্রামের প্রভাবশালী ও বিত্তশালী ঘনশ্যামের লোলুপ দৃষ্টির শিকার হতে বাধ্য হয়। অভাবের তাড়নায় নারীত্বের অপমান ও নীতিবোধের বিসর্জন এখানে চরমভাবে ফুটে ওঠে। স্বামী রামপদ শহরে গিয়েও অবস্থার পরিবর্তন করতে পারে না এবং পরে গ্রামে ফিরে স্ত্রীর জীবনের এই চরম পরিণতির কথা জেনেও নিরুপায় থাকে ।

গল্পটিতে দেখি নারীর প্রতি সমাজের দৃষ্টিভঙ্গি অত্যন্ত নির্মম। তাই রামপদর স্ত্রী মুক্তাকে সহানুভূতির চোখে না দেখে বরং অবজ্ঞা ও শোষণের বস্তু হিসেবে দেখা হয়। পুরুষতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা তার আত্মসম্মান ও স্বাধীনতাকে ধীরে ধীরে নষ্ট করে দেয়। ফলে তার জীবনযাত্রা হয়ে ওঠে অনিশ্চিত ও নিরাপত্তাহীন। তার অসহায়তার সুযোগ নিয়ে ঘনশ্যাম ও সুদাসের মতো লোকেরা ভোগ করতে চায়-

> "সকলের মতো সুদাসের চোখে পড়েছে মুক্তার শাড়িখানা। সকলের মতি সেও টের পেয়েছে মুক্তার দেহটি আজ বেশ পরিপুষ্ট।"[৯]

গল্পের করুণ দিকটি সবচেয়ে বেশি স্পষ্ট হয় যখন দেখা যায়, তার সমস্ত চেষ্টার পরও সে নিজের ভাগ্য পরিবর্তন করতে পারে না। বরং প্রতিনিয়ত সে আরও গভীর সংকটে নিমজ্জিত হয়। তার স্বপ্ন ভেঙে যায়, আশা নিঃশেষ হয়ে যায়, এবং শেষ পর্যন্ত তার পরিণতি হয়ে ওঠে অত্যন্ত মর্মান্তিক।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়-এর 'আজ কাল পরশু' গল্পের মুক্তা চরিত্রটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ এবং গভীর মানবিক বোধে নির্মিত। মুক্তার মধ্য দিয়ে লেখক এক অসহায়, নিপীড়িত এবং ক্রমশ ভেঙে পড়া নারীর জীবনের বাস্তব চিত্র তুলে ধরেছেন।

মুক্তা মূলত দরিদ্র নিম্নবিত্ত সমাজের প্রতিনিধি। তার জীবনের প্রতিটি স্তরে অভাব-অনটন এবং অনিশ্চয়তা বিরাজমান। তবুও গল্পের শুরুতে তার মধ্যে বাঁচার ইচ্ছা ও সামান্য আশার আলো দেখা যায়। সে স্বাভাবিক জীবনের স্বপ্ন দেখে— নিরাপত্তা, সম্মান ও ভালোবাসার আকাঙ্ক্ষা তার মনকে চালিত করে।

তাইতো সে পেটের দায়ে শহরে দেহোপজীবিনী হলেও আবার সে ফিরে আসতে চেয়েছে গ্রামে রামপদের কাছে। কিন্ত মধুকামারের বৌ গিরির মা গ্রামে মুক্তাকে প্রবেশ নিষেধ করে-

> "গিরির মা মুক্তাকে শুধোতে থাকে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে কুৎসিত গালাগালি দেয়, ক্যান ফিরেছিস গাঁয়ে, বুকের কি পাটা নিয়ে? ঝেটিয়ে তাড়াব তোকে। দুর-অ দুর-অ! যা!"[১০]

মুক্তার মত নারীদের অসহায়ের সুযোগ নিয়ে ঘনশ্যামের মতো লোকেরা সমাজের দোহাই দিয়ে তাকে ভোগ করতে চায়। তাই তো "সমাজ তাকে শাসিয়েছে, বৌকে ঘরে নেওয়া চলবে না। নিলে বিপদ আছে।"[১১]

মুক্তার চরিত্রের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো তার সংগ্রামী মনোভাব। প্রতিকূল পরিস্থিতির মধ্যেও সে হার মানতে চায় না। কিন্তু সমাজের নির্মম বাস্তবতা তাকে বারবার আঘাত করে। পুরুষতান্ত্রিক সমাজে সে নিরাপত্তাহীন; পুরুষদের লালসা, শোষণ এবং অবহেলা তাকে ক্রমে দুর্বল করে তোলে। ফলে তার আত্মসম্মান ক্ষুণ্ণ হয় এবং মানসিক ভাঙন শুরু হয়।

গল্পের সময়বিন্যাস— 'আজ', 'কাল', 'পরশু'— মুক্তার জীবনের ক্রমাবনতির প্রতীক।

- 'আজ'-এ মুক্তার মধ্যে আশা ও বাঁচার আকাঙ্ক্ষা বিদ্যমান।
- 'কাল'-এ সেই আশা অনিশ্চয়তায় রূপ নেয়, সংকট ঘনিয়ে আসে।
- 'পরশু'-তে তার জীবন সম্পূর্ণ বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে; সে আর নিজের ভাগ্যের ওপর কোনো নিয়ন্ত্রণ রাখতে পারে না।

মুক্তার করুণ পরিণতি তার ব্যক্তিগত দুর্বলতার ফল নয়, বরং সমাজের নির্মম কাঠামোর ফল। দারিদ্র্য, লিঙ্গবৈষম্য এবং সামাজিক অবহেলা তাকে এমন এক অবস্থায় নিয়ে যায়, যেখানে তার মানবিক মর্যাদা পর্যন্ত বিপন্ন হয়ে পড়ে।

'আজ কাল পরশু' এবং 'দুঃশাসনীয়' গল্পে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় নারীর অসহায় অবস্থাকে শুধু ব্যক্তিগত দুর্ভাগ্য হিসেবে দেখাননি, বরং তা সমাজের কাঠামোগত সমস্যার ফল হিসেবে তুলে ধরেছেন। দারিদ্র্য, লিঙ্গবৈষম্য এবং সামাজিক নিষ্ঠুরতা— এই তিনটির সম্মিলিত প্রভাবে নারীটির জীবন ধ্বংস হয়ে যায়।এই করুণ পরিণতি আসলে একটি ব্যক্তিগত ট্র্যাজেডি নয়; এটি সমস্ত দুর্ভিক্ষপীড়িত নারীর সম্মিলিত পরিণতিরপ্রতীক। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় দেখিয়েছেন, দুর্ভিক্ষ শুধু মানুষকে অনাহারে মারে না, তা তার সম্মান, স্বাধীনতা ও মানসিক শক্তিকেও ধ্বংস করে। বিশেষত নারীরা এই সংকটের সবচেয়ে বড় শিকার।

গল্প দুটির একটি বড় বৈশিষ্ট্য হলো লেখকের নির্মোহ বাস্তবতা। তিনি কোথাও আবেগের বাড়াবাড়ি করেননি, বরং সাধারণ ঘটনার মধ্য দিয়েই নারীর অসহায়তা ও করুণ পরিণতিকে এত গভীরভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন যে তা আরও বেশি হৃদয়স্পর্শী হয়ে উঠেছে। এখানে অসহায় নারীর করুণ পরিণতির মূল কারণগুলো হলো— (১) দুর্ভিক্ষ ও চরম দারিদ্র্য, (২) বস্ত্রসংকট, (৩) পুরুষতান্ত্রিক সামাজিক নিয়ম, (৪) আত্মমর্যাদাবোধে আঘাত, (৫) নিরাপত্তাহীনতা ও বন্দিদশা।

লেখক বোঝাতে চেয়েছেন, সমাজ যখন ন্যূনতম মানবিক চাহিদা পূরণ করতে ব্যর্থ হয়, তখন সবচেয়ে ভয়াবহ আঘাত নেমে আসে নারীর জীবনে। কারণ সমাজ তার উপর শালীনতা ও লজ্জার এমন বোঝা চাপিয়ে দিয়েছে, যা দারিদ্র্যের চেয়েও ভয়ঙ্কর হয়ে ওঠে।

উপসংহার:

সবশেষে বলা যায়, 'আজ কাল পরশু' এবং 'দুঃশাসনীয়' গল্পে অসহায় নারীর করুণ পরিণতি মানবসভ্যতার এক লজ্জাজনক অধ্যায়কে সামনে আনে। মুক্তা, ভুতি ও রাবেয়ার মাধ্যমে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় শুধু নারীর

দুঃখ দেখাননি, বরং দুর্ভিক্ষে বিধ্বস্ত সমগ্র নারীসমাজের অপমান, বেদনা ও মৃত্যুবোধকে শিল্পের উচ্চতায় পৌঁছে দিয়েছেন। তাই এই গল্পে নারীর করুণ পরিণতি পাঠকের মনে গভীর সহানুভূতি ও সামাজিক সচেতনতা সৃষ্টি করে। গল্পে লেখক এক অসহায় নারীর জীবনের করুণ কাহিনী তুলে ধরেছেন, যা শুধুমাত্র একটি ব্যক্তিগত ট্র্যাজেডি নয়, বরং একটি সামাজিক বাস্তবতা। তাই গল্পটি আমাদের বুঝতে সাহায্য করে যে— নারীর অসহায়তা কোনো ব্যক্তিগত ব্যর্থতা নয়, বরং সামাজিক ব্যবস্থার ফল, পিতৃতন্ত্র ও অর্থনৈতিক বৈষম্য নারীর জীবনে গভীর প্রভাব ফেলে এবং সমাজের পরিবর্তন ছাড়া এই সমস্যার সমাধান সম্ভব নয়। অতএব, গল্প দুটি কেবল সাহিত্য নয়, এটি সমাজচেতনার এক গুরুত্বপূর্ণ দলিল, যা আমাদের মানবিকতা ও ন্যায়বোধকে প্রশ্নের মুখে দাঁড় করায়।

তথ্যসূত্র:

১. বন্দ্যোপাধ্যায়, মানিক। গল্প সমগ্র, ১ম খণ্ড। কামিনী প্রকাশালয়, কলকাতা, ২০১৭, পৃ. ৫৯৪।
২. তদেব, পৃ. ৫৯৫।
৩. তদেব, পৃ. ৫৯৫।
৪. দত্ত, বীরেন্দ্র। বাংলা ছোট গল্প: প্রসঙ্গ ও প্রকরণ, ৭ম সংস্করণ। পুস্তক বিপণি, কলকাতা, ২০১৩, পৃ. ৭৬৭।
৫. মুখোপাধ্যায়, অরুণ কুমার। কালের পুত্তলিকা, ২য় সংস্করণ। দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ১৯৯৯, পৃ. ৫৯৫।
৬. বন্দ্যোপাধ্যায়, মানিক। গল্প সমগ্র, ১ম খণ্ড। কামিনী প্রকাশালয়, কলকাতা, ২০১৭, পৃ. ৫৯৫।
৭. তদেব, পৃ. ৫৯৬।
৮. তদেব, পৃ. ৫৯৮।
৯. তদেব, পৃ. ৫৮৪।
১০. তদেব, পৃ. ৫৮৫।
১১. তদেব, পৃ. ৫৮৬।

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি:

১. মিত্র, সরোজমোহন। মানিক বন্ধ্যোপাধ্যায়ের জীবন ও সাহিত্য। কলকাতা, ১৯৯৯।
২. মুখোপাধ্যায়, অরুণ কুমার। কালের পুত্তলিকা, ২য় সংস্করণ। দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ১৯৯৯।
৩. দত্ত, বীরেন্দ্র। বাংলা ছোট গল্প: প্রসঙ্গ ও প্রকরণ, প্রথম খণ্ড। পুস্তক বিপণি, কলকাতা।